দেবী চৌধুরানী

শান্তিপিসি বললেন, "কপালে না থাকলে ঘি, ঠকঠকালে হবে কি। ফেলির বরাতে কাজের লোক নেই। নয়ডায় এসে অবধি হাড়ির হাল। বাসন মেজে কাপড় কেচে ঘর মোছামুছি করেই দিন কেটে যায়। আর চারটে অবসর প্রাপ্ত অফিসারের বৌদের মত শপিং মলে ঘুরে পছন্দসই কেনা কাটা, হলদিরামে বসে দোসা আর ছোলে-ভটুরে সাঁটানো, কিংবা স্রেফ বাড়িতেই কেব্‌ল্ টিভির সামনে বসে হাই তোলা - এসব কিচ্ছুটি হ'বার জো নেই তার। ভোর গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, সারাটা দিন খেটে খেটে হাড় মাস কালি হয়ে গেছে। হাতে পায়ে হাজা হয়ে যেতো এ্যাদ্দিনে, নেহাৎ রবারের গ্লাভ্‌স্ পরার সুবুদ্ধিটুকু দিয়েছেন ঠাকুর ----।"

শান্তিপিসি দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে মুহূর্তকাল চোখ বুজলেন।

তারপর চোখ খুলে নিজের বক্তব্য প্রলম্বিত করতে যাচ্ছিলেন, আমি মওকা বুঝে তার আগেই প্রশ্ন ঝাড়লাম, "কিন্তু কেন? কেন? গতবারে নয়ডা গিয়ে আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি ফেলিদির বাড়ি ফুল-টাইম কাজের লোক আছে। মেয়েটির নাম দময়ন্তী। ফেলিদি তো তার ঘাড়ে ঘর সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কাছে পিঠের অনেকগুলো সংস্থার মেম্বার হয়েছিল একে একে। শনিবার দিন পাখোয়াজ শিখতে যেতো, রোববার তাঞ্জোর পেন্টিং'এর ক্লাশ করতো।"

"ওরে মা-রে, তুই তো দেখছি কিছুই জানিস না! সে মাগী তো মারখুট্টে ডাকাত দলের দেবী চৌধুরানী! পুলিস নাকি হন্যে হয়ে কবে থেকে ফেউয়ের মত পেছনে লেগে ছিল।"

"মানে?"

শান্তিপিসি বার দুই নাক টেনে শুকনো কান্নার আওয়াজ বার করে যারপরনাই করুণ একটা অভিব্যক্তি ফোটালেন মুখে। তারপর ফেলিদির কাজের লোক সংঘটিত ঘটনা পরম্পরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে অগ্রসর হলেন। ওই এক মহা দোষ শান্তিপিসির। কোনও কথা পরিষ্কার করে একবারে বলবেন না, ঘুরপাক খাওয়াতে থাকবেন ক্রমাগত। আমি সেই আঠারো পর্ব মহাভারত বাদ দিয়ে সাদা ভাষায় ব্যাপারটা লিপিবদ্ধ করলাম। আমার জানামতে ব্যাপারটা সত্যি। শান্তিপিসি ছাড়াও পরে অন্যদের মুখে শুনেছি ঘটনাটা। খবরের কাগজে নাকি

রিপোর্ট বেরিয়েছিল সবিস্তারে, তবে আমি সে রিপোর্ট দেখিনি। হাঁটুর ব্যাপার নিয়ে ঠিক সেই সময়টাতে হাসপাতালে পড়েছিলাম ঝাড়া দু'হপ্তা।

ফেলিদির স্বামী অজয় ঘোষ সেনা বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার। দুর্ধর্ষ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিসনে ছিলেন। বাছা বাছা যত বিপজ্জনক এলাকায় চাকরিজীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছে তাঁর। ফেলিদি দুই ছেলেকে নিয়ে অন্যান্য সমগোত্রিয় অফিসার পরিবারের সঙ্গে দিল্লীর আর্মি ক্যাম্পে বহু বছর কাটিয়েছে। অজয় ঘোষ ছুটি ছাটায় আসতেন শুধু। উনি রিটায়ার করার আগেই দুই ছেলে দিল্লীর লেখাপড়া সেরে বিদেশে পাড়ি দিলো এবং সেখানেই লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করে এখন। মাঝে মধ্যে স্বল্প ক'দিনের জন্যে দেশে আসে। কখনো একক, কখনো সপরিবারে। স্বামীর কর্মজীবনে ক্যাম্পে কাজের লোকের অভাব হয়নি ফেলিদির। ক্যাম্পে নানারকম সুব্যবস্থা ছিল। অফিসাররা বিপজ্জনক এলাকায় থাকাকালীন তাদের পরিবারবর্গের সুখ সুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত।

নয়ডার ফ্ল্যাটখানা আগে থেকে বুক করা ছিল। রিটায়ার করার অল্পদিন পরেই বাড়ি পেয়ে অজয় ঘোষ চলে এলেন নয়ডায়। দিল্লীতে সে সময় খবরের কাগজে প্রায়ই চুরি-ডাকাতি-খুনের খবর বেরোতো। দেশের অন্য বড় শহরগুলোতেও এ ধরনের ঘটনার কমতি ছিল না। যাহোক, ফেলিদি সেনাবাহিনীর সুরক্ষিত ক্যাম্পের বাইরে এসে নিজেকে দারুণ বিপন্ন মনে করতে লাগলো। যেহেতু চুরি-ডাকাতি-খুনের যে কেসগুলো পুলিস কিনারা করতে পারতো সেগুলোতে প্রায়শই কাজের লোকের ভূমিকা প্রকাশ পেতো, ফেলিদি কাজের লোক রাখতে সাহস পেলো না।

সত্যিই খেটে খেটে হাড়-মাস কালি হচ্ছিল তার। এমন সময় ভাগ্যক্রমে দময়ন্তীকে পেয়ে গেল। হঠাৎই একদিন দময়ন্তী তার দরজায় এসে ঘণ্টি বাজালো। দোর খুলে ফেলিদি তাকে প্রশ্ন করে জানলো কাজের খোঁজে এসেছে মেয়েটি। কিছুদিন আগে তাদের পাড়ার কারা ট্রাকে লটবহর তুলে নিয়ে বাড়ি খালি করে চলে গেল। দময়ন্তী তাদের বাড়ি কাজ করতো বললো। তাদের সঙ্গে তাকে চেন্নাই নিয়ে যেতে চেয়েছিল তারা, কিন্তু দময়ন্তী চলে গেলে তার বুড়ো বাবা-মাকে দেখাশোনা করার জন্যে আর কেউ থাকবে না। তাই সে চেন্নাই যেতে রাজি হয়নি। প্রশ্ন করে জানা গেল দময়ন্তীর বয়স বত্রিশ এবং সে অবিবাহিতা।

বাবা-মাকে দেখাশোনা করার জন্যেই সে বিয়ে করেনি এবং করবে না। না, সে বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান নয়। তার বড় ভাই আছে। দাদা বিয়ে করে অন্যত্র সংসার পেতেছে। বাবা-মার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অনেক টাকাকড়ি আত্মসাৎ করেছে। দময়ন্তী যে করে হোক তার অসহায় বাবা-মার মুখে দু'বেলা দু'টি অন্ন তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। এছাড়া তার জীবনে অন্য কোন উচ্চাশা নেই।

সে সময় দিল্লীতে একটা সেমিনারে গেছিলাম। চারদিনের সেমিনার। কিছু ছুটি পাওনা ছিল। সব মিলিয়ে দিন আষ্টেক ছিলাম। দিল্লী থাকাকালে দু'বার নয়ডা গেছি। দু'বারই গেছিলাম ফেলিদির আমন্ত্রণে এবং সারাদিন তার সঙ্গে কাটিয়ে এসেছি গল্প গুজব করে। অজয়দার তাশের নেশা, ছুটির দিন উদয়াস্ত তাশ খেলে কাটান সম-মেজাজী অবসর প্রাপ্ত অফিসারদের সাথে।

ফেলিদির বাড়িতে প্রথম দিন দময়ন্তীকে দেখে দারুণভাবে চমকে উঠেছিলাম - এ কে? এ কি? পরনে কাচের-কুচি বসানো লাল ঝলমলে কামিজের নীচে লাল রঙের কাচের-কুচি বিহীন সরু টাইট চুস্ত পাজামা। হাঁটা চলা অতি দ্রুত, কেমন একটা তিড়িং বিড়িং ঘোটকীয় ভাব। ক'বছর আগে হাউস খাসে পুজোর সময় দেখা যাত্রায় বৃহন্নলার পার্ট মনে পড়ে গেল। শশব্যস্তে টেবিল সাজাচ্ছে, রান্নাঘর থেকে থরে থরে খাবার এনে টেবিলে রাখছে। কাঁটা চামচ, জলের গ্লাস, জাগ আনছে। ঠিক যেন একটা দম দেওয়া পুতুল।

ফেলিদি বলল, "মেয়েটার গুণের তুলনা হয় না। দু'মাস হ'ল ঢুকেছে, মোটামুটি সব কাজই শিখে ফেলেছে।"

তবে বাড়ির বাইরে পাঠায় না ওকে - সবজি কেনা, দুধ আনা, রাস্তার মোড়ে প্রেসওলাকে কাপড় দিয়ে আসা এর কোনটাই ওকে দিয়ে করানো যায় না।

"সে কি? কেন?"

শুনলাম মেয়েটি নাকি রাস্তা গুলিয়ে ফেলে।

"দু'মাস এখানে থাকার পরও?"

"দু'মাস বা দু'বছর দুই-ই সমান, ও রাস্তাঘাট একেবারেই মনে রাখতে পারে না।"

দরজার ঘণ্টি বাজলো।

ফেলিদি তড়িৎ বেগে উঠে বলল, "দেখি কে আবার এলো।"

বললাম, "দময়ন্তী রয়েছে তো, ওই খুলে দেবে।"

ফেলিদি ঘাড় নাড়লো।
তারপর দরজা খুলে দিয়ে এসে বলল, "তোর অজয়দা।"

আমরা তিনজনে লাঞ্চ খেতে বসলাম। দময়ন্তী মাঝে মাঝে এসে দেখে যাচ্ছিল। ফেলিদি পঞ্চমুখে দময়ন্তীর প্রশংসা করে যেতে লাগলো। খেতে খেতে আমার হাত থেকে চামচটা হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গেল হঠাৎ। ফেলিদি বলল, ওটা দময়ন্তী তুলে রাখবে'খন। চেয়ার ঠেলে উঠে রান্নাঘরে গিয়ে আরেকটা চামচ এনে আমায় দিলো। দময়ন্তীও ফেলিদির পিছু পিছু এলো। ভারি অবাক লাগলো, ফেলিদি খাওয়া ছেড়ে উঠলো কেন? দময়ন্তীকে বললেই তো চামচ এনে দিতো। আরও খানিক পরে বোঝা গেল দময়ন্তী কানে খাটো, খুব বেশী রকম খাটো। এ কারণেই কাজের লোকের সামনে তার অত প্রশংসা করছিল ফেলিদি, কারণ এর বিন্দু বিসর্গ দময়ন্তীর কানে যাচ্ছিল না। নইলে তো কাজের লোক একেবারে মাথায় চড়ে বসবে।

বুঝলাম ফেলিদি বহু পরিশ্রম করে দময়ন্তীকে কাজ এবং কাজের পর্যায়ক্রম বিষয়ে ট্রেনিং দিয়েছে। তবেই এত সুচারুভাবে সব কিছু করে যাচ্ছে মেয়েটা। শুধু কানেই কম শোনে না। দময়ন্তীকে ভালভাবে লক্ষ্য করে নিঃসন্দেহ হলাম মেয়েটি আংশিকভাবে মানসিক প্রতিবন্ধীও। ওর হাঁটাচলা, অঙ্গভঙ্গি, অতিরঞ্জিত গদগদ অভিব্যক্তি - কোন কিছুই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়। হঠাৎ মনে পড়লো ফেলিদির চাকর-বাকর সংক্রান্ত আতঙ্কের কথা। আংশিক হলেও দময়ন্তীর মত প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কেউ খুনে-ডাকাত হতে পারে না। তাই কি ফেলিদি ওকে বেছে নিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে?

অথচ এত করেও ভবি ভুললো না। সত্যিই বুঝি কাজের লোক বরাতে নেই ফেলিদির। খেটে খেটে হাড় মাস কালি করাই নিয়তি তার।

আমি দিল্লীতে সেমিনারে যোগ দিতে গেছিলাম বছর দেড়েক আগে। ফেলিদির সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান প্রদান বা টেলিফোনে যোগাযোগ কোনকালেই ছিল না। দিল্লী যাবার আগে ফেলিদির ঠিকানা জোগাড় করেছিলাম। ওখান থেকে ফিরে এসে আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। আসলে এসব ব্যাপারে আমি খুব ঢিলা ঢালা। সৌভাগ্যক্রমে আমার আত্মীয় স্বজনরাও আমার কাছ থেকে এ সব প্রত্যাশা করে না। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের পরিবারে খবর রাখারাখির

খুব একটা চলন নেই। আমি হলফ্ করে বলতে পারি আমার হাঁটুর কথা ফেলিদি বিন্দু বিসর্গ জানে না। ঘটনাচক্রে কোনদিন শান্তিপিসির সঙ্গে দেখা হ'লে পিসিই ফেলিদিকে বিশদভাবে জানাবে ব্যাপারটা।

আমি দিল্লী থেকে ফিরে আসার প্রায় মাস ছয়েক পরে ফেলিদির ছোট ছেলে নুটু সপরিবারে দেশে এলো দশ দিনের ছুটিতে। দশ দিনের মধ্যে তিন দিন নয়ডায় বাবা-মার সঙ্গে কাটিয়ে আগ্রা, জয়পুর, উদয়পুর ঘুরে আবার কর্মস্থলে ফিরে যাবে সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে। নুটুর পরিবার বলতে স্ত্রী নেলি ও দু'বছরের কন্যা মেঘনা।

নুটু দিল্লীতে পড়াশোনা করেছে। ওর বেশ কিছু পুরোনো বন্ধু নয়ডার কাছাকাছি এলাকায় থাকে। দল বেঁধে এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করার পর একদিন বাবা-মা'র সঙ্গে পাড়ার সিনেমা হলে সিনেমা দেখার প্রোগ্রাম করা হ'ল। নুটু, নুটুর বউ, অজয় ঘোষ আর ফেলিদি। বাচ্চাটা সিনেমা হলে একেবারে সুস্থির থাকে না। দু'বছরের বাচ্চার কাছে সেটা আশাও করা যায় না। শেষ অবধি তাকে দময়ন্তীর হেফাজতে রেখে রাতের শো-তে যাওয়া ঠিক হ'ল। সে সময় মেঘনা এমনিতেও ঘুমিয়ে থাকে। রাতে জেগে ওঠার অভ্যাস নেই তার। মেঘনা শোবার ঘরে অঘোরে ঘুমোবে, দময়ন্তীর কাজ শুধু তার উপর নজর রাখা। বাড়ির দরজার চাবি এদের সঙ্গে থাকবে, সিনেমা-শেষে নিজেরাই বডি-লক খুলে ঢুকতে পারবে। দরজা খোলার জন্যে দময়ন্তীকে ডাকাডাকি করে রাত দুপুরে পাড়া মাথায় করতে হ'বে না।

তারপর সে রাত্রে যে সব ঘটনা ঘটলো পাড়াসুদ্ধু লোকে জানে। দু'দিন ধরে কাগজে কাগজে সব চাইতে জোরালো খবর ছিল সেটাই। মধ্য রাত্রে নয়ডার একটা ব্লকে চড়াও হয়ে পুলিশ বাহিনী ঝাড়খণ্ডের এক আতঙ্কবাদী নেত্রীকে আহত করে। আটতলা মাল্টিস্টোরি ফ্ল্যাটের ছাদে আত্মগোপন করে ছিল মেয়েটি। মোকাবিলায় দু'জন পুলিশ ও উক্ত নেত্রী গুরুতরভাবে আহত হয় ও হাসপাতালে যাবার পথে মারা যায়। তিনজনেই।

দময়ন্তীর ছদ্মবেশে কি দারুণ অভিনয়টাই না করে গেল জেনিফার মুণ্ডা! পুলিশ হানা দেবে এ কথা দলের কেউ জানিয়েছিল তাকে। ইচ্ছে করলে পুলিশ আসার অনেক আগেই সেখান থেকে চলে যেতে পারতো জেনিফার। পুলিশের

সাধ্যও হ'ত না তাকে ধরে। কিন্তু দু'বছরের মেঘনাকে খালি বাড়িতে ফেলে রেখে সে কিছুতেই পালিয়ে যেতে পারলো না। ফ্ল্যাট ছেড়ে মাল্টি-স্টোরির বারোয়ারী ছাদে লুকিয়ে নীচে রাস্তার দিকে নজর রাখছিল ফেলিদিদের ফেরার প্রতীক্ষায়। ওরা বাড়ি ফিরে আসছে দেখলেই এলাকা ছেড়ে বহু দূরে অদৃশ্য হয়ে যেতো। কিন্তু তার আগেই পুলিশ এসে পড়লো।